আন নসর

১১০

নামকরণ

প্রথম আয়াত إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ-এর মধ্যে উল্লেখিত নসর (نصر) শব্দকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) একে কুরআন মজীদের শেষ সূরা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর আর কোন পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল হয়নি।* (মুসলিম, নাসায়ী, তাবারানী, ইবনে আবী শাইবা ও ইবনে মারদুইয়া)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, এ সূরাটি বিদায় হজ্জের সময় আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময় মিনায় নাযিল হয়। এ সূরাটি নাযিল হবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উটের পিঠে সওয়ার হয়ে বিখ্যাত ভাষণটি দেন। (তিরমিযী, বায়যাবী, বাইহাকী, ইবনে শাইবা, আবদ ইবনে হুমাইদ, আবু ইয়ালা ও ইবনে মারদুইয়া)। বাইহাকী কিতাবুল হজ্জ অধ্যায়ে হযরত সারাআ বিনতে নাবহানের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সময়ের প্রদত্ত ভাষণ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

---

* বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, এরপর কিছু বিচ্ছিন্ন আয়াত নাযিল হয়। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সবশেষে কুরআনের কোন্ আয়াতটি নাযিল হয় সেটি চিহ্নিত করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত বারাআ ইবনে আযেবের (রা) রেওয়ায়াতে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ সেটি হচ্ছে সূরা নিসার শেষ আয়াত يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ। ইমাম বুখারী ইবনে আব্বাসের (রা) উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ সেই সর্বশেষ আয়াতটি হচ্ছে রিবা সম্পর্কিত আয়াত। অর্থাৎ যে আয়াতের মাধ্যমে সুদকে হারাম গণ্য করা হয়েছে। ইমাম আহমাদ, ইবনে মাজাহ ও ইবনে মারদুইয়া হযরত উমর (রা) থেকে যে হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন তা থেকেও ইবনে আব্বাসের এ উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু এ হাদীসগুলোতে এটিকে শেষ আয়াত বলা হয়নি। বরং হযরত উমরের উক্তি হচ্ছে ঃ এটি সর্বশেষে নাযিল হওয়া আয়াতের অন্তরভুক্ত। আবু উবাইদ তাঁর ফাদায়েলুল কুরআন গ্রন্থে ইমাম যুহরীর এবং ইবনে জারীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ রিবার আয়াত এবং দাইনের আয়াত (অর্থাৎ সূরা বাকারার ৩৮–৩৯ রুকূ') কুরআনের নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত। নাসায়ী, ইবনে মারদুইয়া ও ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাসের অন্য একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন তাতে বলা হয়েছে ঃ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ সূরা বাকারার এ ২৮১ নম্বর আয়াতটি হচ্ছে কুরআনের সর্বশেষ আয়াত। আল ফিরইয়াবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ইবনে আব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে এতটুকু বাড়ানো হয়েছে ঃ এ আয়াতটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের ৮১ দিন আগে নাযিল হয়। অন্যদিকে ইবনে আবী হাতেম এ সম্পর্কিত সাঈদ ইবনে যুবাইরের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে এ আয়াতটি নাযিল হওয়া ও রসূলের (সা) ওফাতের মধ্যে মাত্র ৯ দিনের ব্যবধানের কথা বলা হয়েছে। ইমাম আহমাদের মুসনাদ ও হাকেমের মুসতাদরাকে হযরত উবাই ইবনে কা'বের (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ সূরা তাওবার ১২৮–১২৯ আয়াত দু'টি সবশেষে নাযিল হয়।

"বিদায় হজ্জের সময় আমি রসূলুল্লাহ (সা)–কে একথা বলতে শুনেছি ঃ হে লোকেরা! তোমরা জানো আজ কোন দিন? লোকেরা জবাব দিল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটি হচ্ছে আইয়ামে তাশরীকের মাঝখানের দিন। তারপর তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, জানো এটা কোন জায়গা? লোকেরা জবাব দিল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটি হচ্ছে মাশ'আরে হারাম। এরপর তিনি বলেন, আমি জানি না, সম্ভবত এরপর আমি আর তোমাদের সাথে মিলতে পারবো না। সাবধান হয়ে যাও, তোমাদের রক্ত ও তোমাদের মান–সম্মান পরস্পরের ওপর ঠিক তেমনি হারাম যেমন আজকের দিনটি ও এ জায়গাটি হারাম, যতদিন না তোমরা তোমাদের রবের সামনে হাযির হয়ে যাও এবং তিনি তোমাদেরকে নিজেদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। শোনো, একথাগুলো তোমাদের নিকটবর্তীরা দূরবর্তীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে। শোনো আমি কি তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি? এরপর আমরা মদীনায় ফিরে এলাম এবং তারপর কিছুদিন যেতে না যেতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকাল হয়ে গেল।"

এ দু'টি রেওয়ায়াত একত্র করলে দেখা যাবে, সূরা আন নসরের নাযিল হওয়া ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের মধ্যে ৩ মাস ও কয়েকদিনের ব্যবধান ছিল। কেননা ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখা যায়, বিদায় হজ্জ ও রসূলের (সা) ওফাতের মাঝখানে এ ক'টি দিনই অতিবাহিত হয়েছিল।

ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনা মতে এ সূরাটি নাযিল হবার পর রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমাকে আমার মৃত্যুর খবর দেয়া হয়েছে এবং আমার সময় পূর্ণ হয়ে গেছে। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও ইবনে মারদুইয়া) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত অন্যান্য রেওয়ায়াতগুলোতে বলা হয়েছে ঃ এ সূরাটি নাযিল হবার পর রসূলুল্লাহ (সা) বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর, তাবারানী, নাসায়ী, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া)।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, এ সূরাটি নাযিল হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এ বছর আমার ইন্তিকাল হবে। একথা শুনে হযরত ফাতিমা (রা) কেঁদে ফেললেন। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, আমার বংশধরদের মধ্যে তুমিই সবার আগে আমার সাথে মিলিত হবে। একথা শুনে হযরত ফাতিমা (রা) হেসে ফেললেন। (ইবনে আবি হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া) প্রায় এই একই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বাইহাকীতে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত উমর (রা) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বড় বড় জ্ঞানী ও সম্মানিত সাহাবীদের সাথে তাঁর মজলিসে আমাকে ডাকতেন। একথা বয়স্ক সাহাবীদের অনেকের খারাপ লাগলো। তাঁরা বললেন, আমাদের ছেলেরাও তো এ ছেলেটির মতো, তাহলে শুধুমাত্র এ ছেলেটিকেই আমাদের সাথে মজলিসে শরীক করা হচ্ছে কেন? (ইমাম বুখারী ও ইবনে জারীর খোলাসা করে বলেছেন যে, একথা বলেছিলেন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ) হযরত উমর (রা) বললেন, ইলমের ক্ষেত্রে এর যা মর্যাদা তা আপনারা জানেন। তারপর একদিন তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বয়স্ক সাহাবীদের ডাকলেন। তাঁদের সাথে আমাকেও ডাকলেন। আমি বুঝে ফেললাম তাদের মজলিসে

আমাকে শরীক করার যৌক্তিকথা প্রমাণ করার জন্য আজ আমাকে ডাকা হয়েছে। আলোচনার এক পর্যায়ে হযরত উমর (রা) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ সূরাটির ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি? কেউ কেউ বললেন, এ সূরায় আমাদের হুকুম দেয়া হয়েছে, যখন আল্লাহর সাহায্য আসে এবং আমরা বিজয় লাভ করি তখন আমাদের আল্লাহর হামদ ও ইস্তিগফার করা উচিত। কেউ কেউ বললেন, এর অর্থ হচ্ছে, শহর ও দুর্গসমূহ জয় করা। অনেকে নীরব রইলেন এরপর হযরত উমর (রা) বললেন, ইবনে আব্বাস তুমিও কি একথাই বলো? আমি বললাম ঃ না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে তুমি কি বলো। আমি বললাম ঃ এর অর্থ হচ্ছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওফাত। এ সূরায় জানানো হয়েছে, যখন আল্লাহর সাহায্য এসে যাবে এবং বিজয় লাভ হবে তখন আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে, এগুলোই হবে তার আলামত। কাজেই এরপর আপনি আল্লাহর হাম্‌দ ও ইস্তিগফার করুন। একথা শুনে হযরত উমর বললেন, তুমি যা বললে আমিও এ ছাড়া আর কিছুই জানি না। অন্য একটি রেওয়ায়াতে এর ওপর আরো একটু বাড়ানো হয়েছে এভাবে যে, হযরত উমর বয়স্ক বদরী সাহাবীদের বললেন ঃ আপনারা এ ছেলেকে এ মজলিসে শরীক করার কারণ দেখার পর আবার কেমন করে আমাকে তিরস্কার করেন? (বুখারী, মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে জারীর, ইবনে মারদুইয়া, বাগাবী, বাইহাকী ও ইবনুল মুনযির)।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

ওপরে যে হাদীসগুলো আলোচনা করা হয়েছে তাতে একথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর রসূলকে বলে দিয়েছিলেন, যখন আরবে ইসলামের বিজয় পূর্ণ হয়ে যাবে এবং লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকবে তখন এর মানে হবে, আপনাকে যে কাজের জন্য দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল তা পূর্ণ হয়ে গেছে। তারপর তাঁকে হুকুম দেয়া হয়েছে, আপনি আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করতে থাকুন। কারণ তাঁরই অনুগ্রহে আপনি এতবড় কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। আর তাঁর কাছে এ মর্মে দোয়া করুন যে, এই বিরাট কাজ করতে গিয়ে আপনি যে ভুল-ভ্রান্তি বা দোষ-ত্রুটি করেছেন তা সব তিনি যেন মাফ করে দেন। এ ক্ষেত্রে একটুখানি চিন্তা-ভাবনা করলে যে কোন ব্যক্তিই দুনিয়ার মানুষের একজন সাধারণ নেতা ও একজন নবীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখতে পাবেন। মানুষের একজন সাধারণ নেতা যে বিপ্লব করার জন্য কাজ করে যায় নিজের জীবদ্দশাতেই যদি সেই মহান বিপ্লব সফলকাম হয়ে যায় তাহলে এ জন্য সে বিজয় উৎসব পালন করে এবং নিজের নেতৃত্বের গর্ব করে বেড়ায়। কিন্তু এখানে আল্লাহর নবীকে আমরা দেখি, তিনি তেইশ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে পুরো একটি জাতির আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তাধারা, আচার-আচরণ, নৈতিক চরিত্র, সভ্যতা-সংস্কৃতি, সমাজনীতি, অর্থব্যবস্থা, রাজনীতি ও সামরিক যোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছেন। মূর্খতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের মধ্যে আপাদমস্তক ডুবে থাকা জাতিকে উদ্ধার করে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলেছেন যার ফলে তারা সারা দুনিয়া জয় করে ফেলেছে এবং সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহের নেতৃত্ব পদে আসীন হয়েছে। কিন্তু এতবড় মহৎ কাজ সম্পন্ন করার পরও তাঁকে উৎসব পালন করার নয় বরং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করার

এবং তাঁর কাছে মাগফিরাতের দোয়া করার হুকুম দেয়া হয়। আর তিনি পূর্ণ দীনতার সাথে সেই হুকুম পালন করতে থাকেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ওফাতের পূর্বে سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ কোন কোন রেওয়ায়াতে এর শব্দগুলো হচ্ছে ঃ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ খুব বেশী করে পড়তেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল। আপনি এই যে কথাগুলো পড়ছেন এগুলো কেমন ধরনের কালেমা। জবাব দিলেন, আমার জন্য একটি আলামত নির্ধারণ করা হয়েছে, বলা হয়েছে, যখন আমি সেই আলামত দেখতে পাবো তখনই যেন একথাগুলো পড়ি এবং সেই আলামতটি হচ্ছে, اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও ইবনে মারদুইয়া)। প্রায় এ একই ধরনের কোন কোন রেওয়ায়াতে হযরত আয়েশা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ার সময় নিজের রুকু' ও সিজদায় খুব বেশী করে এ শব্দগুলো পড়তেন ঃ سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ এটি ছিল কুরআনের (অর্থাৎ সূরা আন নসরের ব্যাখ্যা। তিনি নিজেই ব্যাখ্যাটি করেছিলেন) (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও ইবনে জারীর)।

হযরত উম্মে সালামা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষের দিকে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে তাঁর পবিত্র মুখে সর্বক্ষণ একথাই শুনা যেতোঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল। আপনি এ যিকিরটি বেশী করে করেন কেন? জবাব দিলেন, আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে, তারপর তিনি এ সূরাটি পড়লেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) রেওয়ায়াত করেন, যখন এ সূরাটি নাযিল হয় তখন থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত যিকিরটি বেশী করে করতে থাকেন ঃ

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ، سُبْحٰنَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ، اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ (ابن جرير ، مسند احمد – ابن ابى حاتم)

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এ সূরাটি নাযিল হবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আখেরাতের জন্য শ্রম ও সাধনা করার ব্যাপারে খুব বেশী জোরেশোরে আত্মনিয়োগ করেন। এর আগে তিনি কখনো এমনভাবে আত্মনিয়োগ করেননি। (নাসায়ী, তাবারানী, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া)।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ① وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ② فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ③

যখন আল্লাহর সাহায্য এসে যায় এবং বিজয় লাভ হয়,[১] আর (হে নবী!) তুমি (যদি) দেখ যে লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দীন গ্রহণ করছে[২] তখন তুমি তোমার রবের হাম্‌দ সহকারে তাঁর তাসবীহ পড়ো[৩] এবং তাঁর কাছে মাগফিরাত চাও।[৪] অবশ্যি তিনি বড়ই তাওবা কবুলকারী।

১. বিজয় মানে কোন একটি যুদ্ধ বিজয় নয়। বরং এর মানে হচ্ছে এমন একটি চূড়ান্ত বিজয় যার পরে ইসলামের সাথে সংঘর্ষ করার মতো আর কোন শক্তির অস্তিত্ব দেশের বুকে থাকবে না এবং একথাও সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, বর্তমানে আরবে এ দীনটিই প্রাধান্য বিস্তার করবে। কোন কোন মুফাস্‌সির এখানে বিজয় মানে করেছেন মক্কা বিজয়। কিন্তু মক্কা বিজয় হয়েছে ৮ হিজরীতে এবং এ সূরাটি নাযিল হয়েছে ১০ হিজরীর শেষের দিকে। ভূমিকায় আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ও হযরত সারাআ বিনতে নাবহানের (রা) যে হাদীস বর্ণনা করেছি তা থেকে একথাই জানা যায়। এ ছাড়াও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) যে একে কুরআন মজীদের সর্বশেষ সূরা বলেছেন, তাঁর এ বক্তব্যও এ তাফসীরের বিরুদ্ধে চলে যায়। কারণ বিজয়ের মানে যদি মক্কা বিজয় হয় তাহলে সমগ্র সূরা তাওবা মক্কা বিজয়ের পর নাযিল হয়। তাহলে আন নসর কেমন করে শেষ সূরা হতে পারে? নিসন্দেহে মক্কা বিজয় এ দিক দিয়ে চূড়ান্ত বিজয় ছিল যে, তারপর আরবের মুশরিকদের সাহস ও হিম্মত নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এরপরও তাদের মধ্যে যথেষ্ট শক্তি–সামর্থ ছিল। এরপরই অনুষ্ঠিত হয়েছিল তায়েফ ও হুনায়েনের যুদ্ধ। আরবে ইসলামের পূর্ণাংগ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে আরো প্রায় দু'বছর সময় লেগেছিল।

২. অর্থাৎ লোকদের একজন দু'জন করে ইসলাম গ্রহণ করার যুগ শেষ হয় যাবে। তখন এমন এক যুগের সূচনা হবে যখন একটি গোত্রের সবাই এবং এক একটি বড় বড় এলাকার সমস্ত অধিবাসী কোন প্রকার যুদ্ধ–বিগ্রহ ও চাপ প্রয়োগ ছাড়াই স্বতস্ফূর্তভাবে

মুসলমান হয়ে যেতে থাকবে। নবম হিজরীর শুরু থেকে এ অবস্থার সূচনা হয়। এ কারণে এ বছরটিকে বলা হয় প্রতিনিধিদলের বছর। এ বছর আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে একের পর এক প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসতে থাকে। তারা ইসলাম কবুল করে তাঁর মুবারক হাতে বাই'আত গ্রহণ করতে থাকে। এমনকি দশম হিজরীতে যখন তিনি বিদায় হজ্জ করার জন্য মক্কায় যান তখন সমগ্র আরব ভূমি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সারাদেশে কোথাও একজন মুশরিক ছিল না।

৩. হামদ মানে মহান আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও। আর তাসবীহ মানে আল্লাহকে পাক-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন এবং দোষ-ত্রুটিমুক্ত গণ্য করা। এ প্রসংগে বলা হয়েছে, যখন তুমি তোমার রবের কুদরতের এ অভিব্যক্তি দেখবে তখন তাঁর হামদ সহকারে তাঁর তাসবীহ পাঠ করবে। এখানে হামদ বলে একথা বুঝানো হয়েছে যে, এ মহান ও বিরাট সাফল্য সম্পর্কে তোমার মনে যেন কোন সময় বিন্দুমাত্রও ধারণা না জন্মায় যে, এসব তোমার নিজের কৃতিত্বের ফল। বরং একে পুরোপুরি ও সরাসরি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী মনে করবে। এ জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। মনে ও মুখে একথা স্বীকার করবে যে, এ সাফল্যের জন্য সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য। আর তাসবীহ মানে হচ্ছে, আল্লাহর কালেমা বুলন্দ হওয়ার বিষয়টি তোমার প্রচেষ্টা ও সাধনার ওপর নির্ভরশীল ছিল—এ ধরনের ধারণা থেকে তাঁকে পাক ও মুক্ত গণ্য করবে। বিপরীত পক্ষে তোমার মন এ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিপূর্ণ থাকবে যে, তোমার প্রচেষ্টা ও সাধনার সাফল্য আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তিনি তাঁর যে বান্দার থেকে চান কাজ নিতে পারতেন। তবে তিনি তোমার খিদমত নিয়েছেন এবং তোমার সাহায্যে তাঁর দীনের ঝাণ্ডা বুলন্দ করেছেন, এটা তাঁর অনুগ্রহ। এ ছাড়া তাসবীহ অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ পড়ার মধ্যে বিস্ময়েরও একটি দিক রয়েছে। কোন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলে মানুষ সুবহানাল্লাহ বলে। এর অর্থ হয়, আল্লাহর অসীম কুদরতে এহেন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। নয়তো এমন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটাবার ক্ষমতা দুনিয়ার কোন শক্তির ছিল না।

৪. অর্থাৎ তোমার রবের কাছে দোয়া করো। তিনি তোমাকে যে কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা করতে গিয়ে তোমার যে ভুল-ত্রুটি হয়েছে তা যেন তিনি মাফ করে দেন। ইসলাম বান্দাকে এ আদব ও শিষ্টাচার শিখিয়েছে। কোন মানুষের দ্বারা আল্লাহর দীনের যতবড় খিদমতই সম্পন্ন হোক না কেন, তাঁর পথে সে যতই ত্যাগ স্বীকার করুক না কেন এবং তাঁর ইবাদাত ও বন্দেগী করার ব্যাপারে যতই প্রচেষ্টা ও সাধনা চালাক না কেন, তার মনে কখনো এ ধরনের চিন্তার উদয় হওয়া উচিত নয় যে, তার ওপর তার রবের যে হক ছিল তা সে পুরোপুরি আদায় করে দিয়েছে। বরং সবসময় তার মনে করা উচিত যে, তার হক আদায় করার ব্যাপারে যেসব দোষ-ত্রুটি সে করেছে তা মাফ করে দিয়ে যেন তিনি তার এ নগণ্য খেদমত কবুল করে নেন। এ আদব ও শিষ্টাচার শেখানো হয়েছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। অথচ তাঁর চেয়ে বেশী আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা ও সাধনাকারী আর কোন মানুষের কথা কল্পনাই করা যেতে পারে না। তাহলে এ ক্ষেত্রে অন্য কোন মানুষের পক্ষে তার নিজের আমলকে বড় মনে করার অবকাশ কোথায়? আল্লাহর যে অধিকার তার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তা সে আদায় করে দিয়েছে এ

অহংকারে মত্ত হওয়ার কোন সুযোগই কি তার থাকে? কোন সৃষ্টি আল্লাহর হক আদায় করতে সক্ষম হবে, এ ক্ষমতাই তার নেই।

মহান আল্লাহর এ ফরমান মুসলমানদের এ শিক্ষা দিয়ে আসছে যে, নিজের কোন ইবাদাত, আধ্যাত্মিক সাধনা ও দীনি খেদমতকে বড় জিনিস মনে না করে নিজের সমগ্র প্রাণশক্তি আল্লাহর পথে নিয়োজিত ও ব্যয় করার পরও আল্লাহর হক আদায় হয়নি বলে মনে করা উচিত। এভাবে যখনই তারা কোন বিজয় লাভে সমর্থ হবে তখনই এ বিজয়কে নিজেদের কোন কৃতিত্বের নয় বরং মহান আল্লাহর অনুগ্রহের ফল মনে করবে। এ জন্য গর্ব ও অহংকারে মত্ত না হয়ে নিজেদের রবের সামনে দীনতার সাথে মাথা নত করে হামদ, সানা ও তাসবীহ পড়তে এবং তাওবা ও ইসতিগফার করতে থাকবে।